Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, published on July 2024, Page No. 01 - 08
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য : কায়া সাধনার সাহিত্যিক ঐতিহ্যের সন্ধান ও বিশ্লেষণ

সন্দীপ কুমার সার্দুল
গবেষক, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : sandipsardul53@gmail.com

Received Date *16. 06. 2024*
Selection Date *20. 07. 2024*

Keyword
kayasadhana, charyapada, mangal literature, budhism, tantraism, nathaism, bengali culture.

Abstract
How Kayasadhana was involved in the literature written in the early era of Bangladesh and how that guided the literature is outlined in this article. Kayasadhana has sometimes come as a theory in literature, and the use of Kayasadhana has also indicated the unity of different nations. In this way, the tradition of religious consciousness of the Bengali can also be grasped.

Discussion

বাংলা সাহিত্য তার জন্মলগ্ন থেকেই ধর্ম সম্পৃক্ত। এ কারণে বাঙালিকে তার ধর্ম ছাড়া কল্পনা করা যায় না। তাঁর জাতি সত্তার সঙ্গে ধর্ম এমনভাবে মিশে আছে যে, ধর্মের রশি ধরে টান মারলে, বাঙালির সত্তা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। এজন্য বাঙালির জীবনদর্শনে তার ধর্ম গভীরভাবে ছাপ ফেলে, তার মানসসংস্কৃতিকেও নানাভাবে উন্নত করেছে। 'মানস সংস্কৃতি' বলতে বোঝাতে চাওয়া হচ্ছে, মানুষের উন্নত চিন্তা-চেতনার বিভিন্ন স্তরকে। মানুষের চিন্তা-চেতনা অনেকাংশে এই ধর্মবোধের দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। উদাহরণ স্বরূপ চৈতন্যদেবের কথা বলা যেতে পারে। তাঁর প্রেমধর্মের জোয়ারে অনেক ধর্ম খড়কুটোর মত ভেসে গিয়েছিল। ইসলামের মত একটি সংরক্ষণশীল ধর্ম থেকেও স্বভাবে বৈষ্ণব কবিদের দেখা মিলেছিল। অর্থাৎ চৈতন্যদেব মধ্যযুগের বাঙালি সমাজে প্রেম ধর্মের বাতাবরণ তৈরি করেছিলেন। সমাজ পরিমার্জিত-সংস্কৃত হয়েছিল। মঙ্গলসাহিত্যের মধ্যেও তার প্রভাব পড়তে থাকে। প্রভাসচন্দ্র সেন ধর্মের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগের বিষয়টি বোঝাতে— বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ১৫তম বর্ষের লেখায় উল্লেখ করেছেন, — 'আমাদের গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবনে যে সকল কর্তব্য নির্দিষ্ট হইয়াছিল, ধর্মকে ভিত্তি করিয়াই তাহাদের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। এমনকি আমাদের রাজনীতি ও যুদ্ধবিগ্রহ পর্যন্ত ধর্মের প্রভাব এড়াইতে পারে নাই। ...তাই আমাদের প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য ধর্মমূলক— আমাদের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য শিল্প ধর্মকে আশ্রয় করিয়া সৃষ্ট ও পরিবর্ধিত। তাই দেব-প্রতিমা গঠনেই আমাদের দেশের শিল্পীগণের শিল্পচাতুর্য পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে— দেব মন্দির নির্মাণে স্থপতিগণের নৈপুণ্য সিদ্ধিলাভ করিয়াছে—কবি ও সাহিত্যিকগণের লেখনীমুখেও কেবল ধর্মের কাহিনীই ফুটিয়া বাহির হইয়াছে।' প্রাচীন ও মধ্যযুগের সমাজে ধর্ম যে কত প্রবলভাবে বাঙালিদের উপর প্রভাব ফেলেছিল, তা এই উক্তি থেকে বোঝা যাবে। প্রাচীন বাংলাদেশে ধর্মচর্চার সঙ্গে কায়া সাধনার ধারা প্রচলিত

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 01
Website: https://tirj.org.in, Page No. 01 - 08
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ছিল। অনেক ক্ষেত্রে প্রাচীন দেব-দেবীর সঙ্গে কায়া সাধনার দিকটি সংযুক্ত ছিল। যেমন নব চর্যাপদে বৌদ্ধ দেব-দেবীর সঙ্গে কায়াসাধনা এবং আবার গ্রামীণ দেবী মনসা, চণ্ডীর সাধনার সঙ্গে এই কায়া সাধনার প্রচলন ছিল। অর্থাৎ গ্রামীণ দেবদেবী বাদ দিয়ে কায়া সাধনার মধ্যে দিয়ে প্রাচীন বাঙালি তাদের ধর্মীয় জীবন অতিবাহিত করত।

আবার, প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলাদেশে কায়াসাধনপন্থী নানা ধর্মমতের প্রভাব ছিল। যেমন নাথ, বৌদ্ধ সহজিয়া সাধক, বৌদ্ধ তান্ত্রিক, জৈন (বগুড়ায়) এবং অনেক পরে বাউল-ফকির। এরা প্রত্যেকেই কায়া সাধনার মধ্যে দিয়ে অমৃতের পুত্র হতে চাইতেন। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে নানাভাবে এই ধর্মমতগুলির কথা পাওয়া যাচ্ছে। অনেকসময় কায়া সাধনার সেই দিকগুলিও সাহিত্যের প্লট নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে।

প্রাচীন যুগ থেকেই লিখিত বাংলা সাহিত্যে কায়া সাধনার প্রসঙ্গ রয়েছে। মনসামঙ্গল থেকে শুরু করে চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল। এর কারণ কী? এর কারণ হল বাংলাদেশে কায়াসাধনা সমন্বিত হঠযোগের প্রভাব। অনেকে বলেন তন্ত্র আর হঠযোগ অভিন্ন। কিন্তু তন্ত্রের মধ্যে যে সমস্ত ক্রিয়াকলাপ রয়েছে তা মূলত হঠযোগ। আমাদের মতে, বাংলাদেশেই হঠযোগ বিশেষভাবে সমীকৃত হয়ে তন্ত্রের উদ্ভব ঘটিয়েছিল। এক্ষেত্রে প্রাচীন কোমজাতির কোনো কোনো সংস্কার হঠযোগের সঙ্গে মিশে তন্ত্রের উদ্ভব ঘটিয়েছিল। প্রকৃতই তন্ত্র কিছু নয়, সবটাই হঠযোগের প্রক্রিয়া। পরে এরসঙ্গে শিবশক্তি সংযুক্ত হয়ে থাকবে।

বাংলাদেশে আদিম কোম জাতির মধ্যে (তখনও বাংলা ভাষাকেন্দ্রিক বাঙালি জাতিসত্তা নির্মিত হয়নি) ধর্মতন্ত্র প্রবেশের আগে সম্ভবত ব্রতধর্মী কোনো কোনো অনুষ্ঠান কোম সমাজগুলিতে প্রচলিত ছিল। ব্রতের মধ্যেই তাদের কামনা বাসনা প্রচ্ছন্ন আকারে পরিবেশিত হত। বাঙালি সমাজে ধর্মতন্ত্র বলে যে ধারণা আজ প্রচলিত, সম্ভবত চতুর্থ শতাব্দীর শেষে গুপ্ত আমলের আগে বাংলাদেশে তা সে আকারে প্রচলিত ছিল না। বাংলাদেশের অনার্যেরা কোনো বিশেষ ধর্ম পালন করত বলে মনে হয় না। অনার্যদের এই ব্রতধর্মী রীতিনীতি বাংলাদেশে অনেকদিন ধরেই জনসমাজে প্রচলিত সংস্কাররূপে বহাল ছিল। প্রাচীন চণ্ডীদেবীর কল্পনায় এবং সেইসঙ্গে তার পূজা-পদ্ধতিতে ব্রতধর্মী রীতিনীতি পালন করতেন বাংলার নারীরা। নাথ সাহিত্যে (সুকুর মামুদের গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস গ্রন্থে) এই রীতিনীতির প্রমাণ পাওয়া গেছে। এই ব্রতের দেবতারাই কালক্রমে আর্যীকরণের সময়ে নানা দেবতাতে পরিণত হয়। কিংবা এখনও কেউ কেউ গ্রামীণ দেবতারূপে পূজিত হয়।

কালের বিবর্তনের ধারায় বাংলাদেশে কায়াসাধনা নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করে, বাঙালির আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের সঙ্গে সমন্বিত হয়। সম্ভবত কায়াসধনার ধারা সমৃদ্ধ হয়েছিল পাল আমলে। প্রায় ৪৫০ বছরের পাল আমল ছিল ঐক্যমূলক ভাবধারার ইতিহাস। বৌদ্ধ নাথধর্মের বিকৃতি এবং একই সঙ্গে বিস্তৃতি ঘটেছিল এই পাল আমলেই। বৌদ্ধ গুরু অসঙ্গের নেতৃত্বেই মূলত তন্ত্র বৌদ্ধ ধর্মে প্রবিষ্ট হয়েছিল। কালক্রমে সেখান থেকেই তন্ত্রনয়, বজ্রযানের সহজযানের উৎপত্তি হয়। নাথধর্মের মধ্যেও তন্ত্র প্রবিষ্ট হয়েছিল পাল আমলেই। নাথেরা মূলত হঠযোগ কায়াসাধনপন্থী ধর্মসম্প্রদায়।

তবে সহজ সাধনা একটি আলাদা কোনো ধর্ম সম্প্রদায় থেকেই এসেছিল বলেই মনে হয়। তা শুধুমাত্র বৌদ্ধ ধর্মের নয়, কারণ সহজপন্থা মধ্যযুগের ভারতবর্ষে নানা ধর্মসম্প্রদায়কে প্রভাবিত করেছে। 'পাহাড়পুর দোহা' (প্রবাসীতে প্রকাশিত) নামে যে জৈন দোহা আবিষ্কার হয়েছে, যা অপভ্রংশে লেখা, সেখানে এই সহজযানের কথা আছে। বাংলাদেশে 'মীননাথ গোরক্ষগোষ্ঠ' নামে নাথ সাহিত্যের পুথি পাওয়া গেছে সেখানেও এই সহজ সাধনার কথা রয়েছে। অর্থাৎ সহজ সাধনা শুধু বৌদ্ধদের বলা যায় কি করে? আমাদের ধারণা হঠযোগ থেকেই এই সহজযানের উৎপত্তি হয়েছিল।

চর্যাপদেই দেখা যাচ্ছে, সহজ সাধনা এবং তান্ত্রিক বৌদ্ধ সাধনার মধ্যে বিস্তর পার্থক্যের কথা রয়েছে। সহজ সাধনা কোনো আড়ম্বরহীনভাবে সোজা পথে যাবার কথা বলে। কিন্তু তান্ত্রিক বৌদ্ধ সাধনায় যেমন নারী সাধনার ইঙ্গিত রয়েছে। মন্ত্র উচ্চারণ এবং বোধিসত্ত্ব পূজা, ধর্মপূজা, (এই ধর্ম থেকেই ধর্ম পূজার প্রচলন, অষ্টসহসহস্রিকার ১০৮ নম্বর পৃষ্ঠায় এই ধর্ম পূজার প্রচলন আছে) এছাড়া বিভিন্ন গুহ্যাচারের প্রচলন রয়েছে। যেমন কাহ্নপাদ একটি পদে এই বৌদ্ধতান্ত্রিক মতবাদের প্রতি বিতৃষ্ণা প্রকাশ করে সহজমার্গের কথা বলেছেন—

"জো মনগোএর আলাজালা।

আগম পোথা টন্টা মালা।।
ভণ কইসে সহজ বোলবা যাঅ।"[১]

যা মনগোচর তাই-ই বৃথা আড়ম্বর, -আগম পুথি মিথ্যা মিথ্যার মালা। বল কি করে সহজকে পাওয়া যায়? তুলনায় তান্ত্রিক বৌদ্ধ সাধনার একটি পদ লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, সেখানে গুহ্যাচার কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে—

"তিঅড্ডা চাপী জোইণি দে অঙ্কবালী।
কমলকুলিশ ঘান্টে করহু বিয়ালী।।
যোইণি তঁই বিণু খণহি ন জীবমি।
তো মুহ চুম্বী কমলরস পিবমী।।"[২]

জঘন চেপে যোগিনী সাধককে আলিঙ্গন দেয়, পদ্ম ও বজ্রের সংঘর্ষে বিকাল কর বা কাল কাটিয়ে দাও। যোগিনী তোকে ছাড়া মুহুর্তো বাঁচিনা, তোর মুখ চুম্বন করে কমল রস পান করি। সহজ সাধনার পাশে এই যৌনাচার সম্বলিত পদ একই ধর্ম সম্প্রদায়ে বিপরীত মেরুতে অবস্থিত দুই সাধনার কথা বলছে। এর মধ্যে কায়া সাধনার বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু চর্যাপদের সমকালে ব্যবহৃত হঠযোগ তথা কায়াসাধনার প্রণালীগুলি সাহিত্যকে তত্ত্বের রূপ দিয়েছে, যাকে আমরা রূপক বলি তা মূলত কায়াসাধনাকে ব্যবহার করেই রচিত হয়েছিল। সাহিত্যকে তাত্ত্বিক রূপো দেবার কাজে একালের কবিরা যেমন বিবিধ তত্ত্বের অবতারণা করে থাকেন, তেমনই সেকালে কবিরা কায়াসাধনাকে তত্ত্বস্বরূপে ব্যবহার করতেন। এই তত্ত্বগুলি অনেক ক্ষেত্রে প্রহেলিকার আকার ধারণ করেছে। মধ্যযুগের বিস্তৃত সাহিত্যের পাঠ নিলে বিষয়টি ক্রমে স্পষ্ট হবে।

যদিও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে সাধনপ্রণালীকে কাহিনির কাঠামোর সঙ্গে সংলগ্ন করে দেখানো হয়েছে। এই কাব্যের বংশীখণ্ডের শেষে কৃষ্ণ রাধার প্রতি কায়াসাধনার কথা তুলে ধরেছেন তার বিরাগের প্রতীকস্বরূপে। কৃষ্ণ এখন রাধার প্রতি আর আসক্ত নয়, পরিবর্তে সে এখন ব্রহ্মের প্রতি মন সমর্পণ করে, কায়াসাধনার পথের পথিক। তাই প্রেমে আনত, ঘর-সংসারের বাধা বন্ধনহীন, কামনা-কাতর রাধার প্রতি তার কঠোরোক্তি—

"অহোনিশি যোগ ধেআই।
মন পবনে গগনে রহাই।।
মূল কমলে করিলে মধুপান।
এঁবে পাইএঁা আম্ভে ব্রহ্মগেআন

...

দশমী দুয়ার দিঁলো কপাট

...

গেআনে ছেদিলোঁ সে মদনবাণ।।
তে আর না ভোলো তোম্ভার যৌবন।।
এবে দেহে মোর নাহি বিকার।
অসার দেখিলো সকল সংসার।।"[৩]

অনেক আগে থেকেই রাধার কাছে থেকে সরে যাবার ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছিল, কিন্তু পূর্বের পদে রাধার কাতোরোক্তির পরে, এই লাইনগুলি আমাদের আচমকা চমকিত করে। বিশেষত শেষের দুটি লাইন। কৃষ্ণ এখন গততৃষ্ণ কৃষ্ণ। বোধহয় কৃষ্ণের মুখ থেকে শোনানোর দরকারও ছিল। কিন্তু আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, খুব কি দরকার ছিল? না শোনালেই বা কি ক্ষতি হত? কবি কথাগুলি শুনিয়ে অনেকবেশি আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। এর ফলে ঘটনার মধ্যে অনেক গতি সঞ্চারিত হয়েছে। কাহিনিটি এই পর্যায়ে শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছেছে। কবির একাজগুলি সাধিত হয়েছে কায়াসাধনার প্রয়োগ ঘটিয়ে। এতে কাহিনিটি শিল্পমণ্ডিত হয়েছে। এজন্য বলা হয়েছে যে, মধ্যযুগের কবিরা তাদের সাহিত্যে কায়াসাধনার প্রয়োগ বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে করতেন।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 01
Website: https://tirj.org.in, Page No. 01 - 08
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মধ্যযুগের আর একটি শাখা নাথ সাহিত্য। এই নাথ সাহিত্য নাথ ধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এই কাহিনি কথাতে নানা ভাবে নাথ ধর্মদর্শন স্থান করে নিয়েছে। এবং এই কাহিনিগুলি প্রকৃতপক্ষে নাথ সাধকদের দ্বারা গড়ে উঠেছিল তার প্রমাণ আছে। এই সাহিত্যগুলি পঞ্চদশ শতকের প্রারম্ভেই লেখা হয়েছিল। মধ্যযুগে এই সাহিত্য আবার নতুন করে লেখা হয়েছিল। যাইহোক, প্রহেলিকাময় কায়াসাধনার কথা একটি পদে বেশ ধরা আছে–

"গুরু হে একটি কথা শুনেছিলাম ত্রিপেনির ঘাটে।
মরা মানুষে ভাত রাধে জিয়া মানুষের পেটে।।"[৪]

গোরক্ষনাথ ছদ্মবেশে তাঁর শাপগ্রস্ত গুরু মীননাথকে উদ্ধার করতে কদলীনগরে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন, গুরু কদলী নগরীর নারীদের মোহে আবিষ্ট হয়ে, আবদ্ধ হয়ে আছেন। এদিকে গুরুদেব ছদ্মবেশী শিষ্য গোরক্ষনাথের কোনো কথার অর্থ বুঝতে পারছেন না, গোরক্ষনাথও নানাভাবে যোগের অনুষঙ্গে প্রহেলিকাময় বাক্য নিরন্তর আওড়ে চলেছেন। একে ছদ্মবেশী তায় আবার প্রহেলিকা। মীননাথ কথার আবরণ খুলে ফেলে কোনোক্রমেই মুক্ত হতে পারেননি। গোরক্ষনাথকে তার ছদ্মবেশ খুলে ফেলতে হয়েছে, এমনকি কথার মধ্যে এই রূপকের আবরণ উন্মোচন করতে হয়েছে। যাইহোক, চর্যাপদের পর, এই নাথ সাহিত্যেই বোধহয় কায়াসাধনাকে রূপকের রূপ দেওয়া হয়েছে। তবে সাহিত্যের সংরূপ আলাদা হওয়ায় পার্থক্যও আছে, চর্যাপদে ছোটোপদে আর নাথ সাহিত্যে আখ্যায়িকায়। আখ্যায়িকার মধ্যে এই রূপক পদগুলি ক্রমান্বয়ে ব্যবহারের ফলে সাহিত্যেটি শিল্প গুণান্বিত হয়েছে।

হঠযোগের সঙ্গে তন্ত্রের সংযুক্তিকরণ বাংলাদেশে পাল আমলে দশম শতকের মধ্যে সংঘঠিত হয়েছিল বলে মনে হয়। নাথদের লেখা হঠযোগের অনেক অংশ তন্ত্রের সঙ্গে মিশেছে। বাংলাদেশের তন্ত্র বলতে এই হঠযোগ সমন্বিত তন্ত্রকে বুঝতে হবে। এই তন্ত্র সম্বন্বিত বাঙালি মানসিকতাই বোধহয় নারীকেন্দ্রিক মঙ্গলকাব্য লেখার প্রথম প্রেরণা হিসেবে এসেছিল। কারণস্বরূপ বলা যায়, প্রায় মঙ্গলকাব্যগুলিতে তন্ত্র সমন্বিত কায়াসাধন প্রণালী এত গভীরভাবে প্রয়োগ হয়েছে, যে মঙ্গলকাব্যের উদ্ভাবনে, হিন্দুতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণকে দায়ী করা থেকে এখন বিরত করতে হয়। আর, ত্রয়োদশ শতক থেকেই নাথতন্ত্রকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলমান সম্মিলনের প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে 'অমৃতকুণ্ড' বইটিতে, তবে হঠযোগ সমন্বিত তন্ত্রকে বা নাথতন্ত্রকে কেন্দ্র করে আর্য বাঙালি ও হিন্দু বাঙালি সম্মিলন না ঘটার কিছু নেই। হঠযোগ সমন্বিত তন্ত্রের প্রভাব বৌদ্ধদের মধ্যে বিপুল পরিমাণে পড়েছিল। যদিও তৎকালীন তন্ত্রের মধ্যে বৌদ্ধদের নিজস্ব কিছু ভাবনাও যে ঢুকেছিল, সে কথা অস্বীকার করার কিছু নেই। কিন্তু তন্ত্র সাধনার মূল অংশ যে কায়সিদ্ধি, সেটি সম্পূর্ণভাবে হঠযোগ প্রভাবিত।

সে যাইহোক, বাংলা ভাষার আদি যুগে রচিত চর্যাপদে কায়াসাধনার কথা থাকলেও মঙ্গল সাহিত্যের মধ্যে এই কায়া সাধনার প্রসঙ্গ বারবার লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তার কারণ কী? এর কারণস্বরূপ বলা যায়, বাংলাদেশের তদানীন্তন জনমানসে তন্ত্র প্রভাব। তন্ত্রের পুরুষ প্রকৃতি ভাবনা শাক্ত সাহিত্য মনসামঙ্গলে তথা মঙ্গলকাব্যগুলিতে লক্ষ্য করা যায়। বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গলে তন্ত্রোক্ত কায়াসাধনার কথা বলা হয়েছে–

"ধ্যান যুড়িলা তবে দেবী বিষহরি।
পদ্মা বলে বাপু তুমি দে অধিকারী।।
কর্ণে মন্ত্র পড়িয়া বলে উঠ উঠ।
মুখ বাইয়া বিষ পড়ে ফুট ফুট।।
বুকে হাত দিয়া পদ্মা জপে মহাজ্ঞান।
গাও মোড়া দিয়া উঠে শিব তখন।।"[৫]

আর একটি জায়গায় সরাসরি কায়াসিদ্ধির কথা এসেছে–

"সেই অন্ন খাইয়া অমর হইলুম।।
ভোজন করিয়া শেষ এক অন্ন পাইল।
সেই অন্ন মুই ব্রহ্মতালুরে থুইল।।"[৬]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 01
Website: https://tirj.org.in, Page No. 01 - 08
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এখানে ব্রহ্মতালুতে অন্ন রাখা বলতে বোঝানো হয়েছে— দেহের ব্রহ্মতালু থেকে ক্ষরিত চন্দ্রস্থ অমৃত রসকে ব্রহ্মতালুতে রাখলে সাধক কায়সিদ্ধ হয়। সাধকের কায়সিদ্ধি হলে, তবেই সাধক জ্ঞানকে দেহে ধারণ করতে পারবে। আবার আর একটি জায়গায় পদ্মাবতীর সম্পর্কে বলা হয়েছে—

> “আরবার পদ্মাবতী জোড়িলেক ধ্যান।
> নিজ মন্ত্র সাধে দেবী করিয়া।।
> ক্ষীরনদীর সাগরে পড়িল সার ভাটা।
> পদ্মাবতী বস্থি বায়ে খলই ধরে নেতা।
> ওকূলে থাকিয়া ডোমনি হাসিয়া গড়ি জায়ে।।”[৭]

উপরের পদটি পুরোপুরি বৌদ্ধতন্ত্র প্রভাবিত। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, তন্ত্রের মধ্যে বৌদ্ধ মানসিকতার চিহ্ন রয়েছে, ‘ডোমনি’ শব্দের ব্যবহার সেই বৌদ্ধ তন্ত্রের বিষয়টিকেই তুলে আনে। মূলত ১০ম শতাব্দীর বৌদ্ধতন্ত্র। বৌদ্ধরা সহস্রারে ‘ডোমনী’, ‘কামলী’ এইসমস্ত নামগুলিকে সংযুক্ত করেছে। যদিও উক্ত পদে, হঠযোগের কায়সিদ্ধি এবং বৌদ্ধদের সাধনার একীকরণ ঘটেছে। হঠযোগের কায়সিদ্ধির বিষয়টির কথায় পরে আসছি, এখন বৌদ্ধসাধনার বিষয়টির কথায় আসা যাক। ‘ক্ষীরনদীর সাগরে পড়িল সার ভাটা/ পদ্মাবতী বস্থী বায়ে, খলই ধরে নেতা’ একথাটির বাহ্যিক অর্থ আছে, অন্তর্নিহিত অর্থ আছে। বাংলাদেশের আঞ্চলিক উপভাষা ‘খলই’ শব্দের অর্থ মাছ রাখার চুবড়ি। অর্থাৎ পদ্মাবতী মাছ ধরছে এবং নেতা চুবড়িতে মাছ রাখছে। ওকূলে দাঁড়িয়ে ডোমনী হাসছে। কিন্তু বৌদ্ধতন্ত্র সাধনার ইঙ্গিত আছে এখানে সহস্রারে ডোমনী আছে, তার কাছে পৌছতে হবে, দেহনৌকায় সাধক পাড়ি দিয়েছে, এক-একটি স্তর ভেঙে সে উল্টা সাধনার মধ্য দিয়ে ডোমনীর কাছে পৌঁছচ্ছে। দেহের এক-একটি- স্তর অতিক্রম সাধকের কাছে, শিকারের মত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শিকারের প্রসঙ্গে চর্যাপদের ৬ নম্বর পদটির কথা স্মরণে আসে— ‘খনহ না ছাড়অ ভুসুকু অহেরী।’ ভুসুকু নিজের প্রকৃতিদোষকে বা অবিদ্যাকে শিকার করে করে সহস্রারে পৌঁছেছে। মনসামঙ্গলেও মাছ শিকারের মধ্যে দিয়ে ডোমনীর কাছে বা সহস্রারে পৌঁছনোর ইঙ্গিত রয়েছে। কিন্তু সহস্রারে পৌঁছেই বৌদ্ধসাধকের কিংবা সাধকের কাজ শেষ নয়, সহস্রার থেকে ক্ষরিত অমৃতরস সাধক ভক্ষণ করবেন। দেহ অজর-অমর হবে। বৌদ্ধদের মন্ত্রনয়ের তিনটি ‘যান’-এ অজর অমর হওয়ার কথা আছে। যদিও চর্যাপদের সহজিয়া একটি গানে অজর অমর হওয়ার বিশ্বাসকে নিন্দা করা হয়েছে। চর্যাপদগুলি মূলত বৌদ্ধ সহজিয়া বিশ্বাসীদের পদ হলেও কিছু পদে বজ্রযানের প্রভাব আছে।

মনসামঙ্গলের এই পদটি ব্যবহারের দ্বারা বোঝানো হয়েছে, মনসাদেবী লক্ষীন্দরের শরীরে প্রবেশ করে নিজেই সাধকের দেহকে অজর-অমর কায় এ পরিণত করছেন। এখানে সাধক মনসা নয়, সাধকদেহ লক্ষীন্দর, দেবী তাকে প্রাণদানের কাজ করছেন এবং তাঁর দেহকে অজর-অমর হবার কাজে সাহায্য করছেন। বজ্রযানের প্রভাব বেশি করে আছে মনসামঙ্গলের এই পদে। বোধহয় বৌদ্ধদের দ্বারা হিন্দু দেব দেবী উদ্ভবের ইতিহাসের একটুকরো ছবি লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

আর একটি বিষয় লক্ষণীয়, এই ভাবের বেশ কয়েকটি পদ অর্থাৎ এরূপ প্রহেলিকাররূপ পদের সাক্ষাৎ বিশ্বভারতীর ‘পুথি পরিচয়’ অংশে অনেক পাওয়া গেছে। চন্দ্র সূর্য দুটি ভাই/ কাটা ঘা ফুয়তে উড়াই।/ নাহি রকত নাঞি পূঁজ কাটা ঘা মু বুজ/ মনসামঙ্গলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে, কিভাবে কায়াসাধনার প্রহেলিকাময় পদগুলি সাধারণ্যে বিবর্তিত হয়ে মন্ত্রের আকার পেয়ে, জলাজঙ্গল বাংলাদেশের জনসাধারণের জীবন ধারণের সঙ্গে মিশে গেছে।

মনসামঙ্গলে কায়াসাধনার প্রয়োগিক দিকের সার্থকতা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যাচ্ছে, মনসার বিষ তোলার বিষয়ে কায়াসাধনার বিষয়টি সংযুক্ত করে, কাহিনিটি তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছেন কবি। বিষ তোলার বিষয়টি মনসামঙ্গল কাব্যে উৎকণ্ঠার কাজ করেছে, এই উৎকণ্ঠিত বিষয়ে কায়াসাধনার বিষয়টি সংযুক্ত করেছেন। এই যে কাহিনিভাগে কায়াসাধনার বিষয়টি সংযুক্ত করা হয়েছে, এখানে লেখকের শিল্পকুশলতার দিক ধরা পড়েছে।

সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধের কবি সৈয়দ আলাওল ‘পদ্মাবতী’ রচনায় কায়াসাধন প্রণালীকে কাহিনির মূল ভিত্তিস্বরূপ এনেছেন। কায়াসাধনার পন্থা হিসেবে নাথতন্ত্রকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এমনকি নাথ সাধক গোপীচন্দ্র,

গোরক্ষনাথ এদের কথা বিভিন্ন সূত্রে আনা হয়েছে কাব্যটিতে। তবে নাথদের হঠযোগ ভাবনাও বেশ গুরুত্ব পেয়েছে। তন্ত্র বৌদ্ধদের সঙ্গে মিশে যেমন বৌদ্ধতন্ত্র নাম ধারণ করেছে, তেমনি নাথতন্ত্র বলেও আলাদা একটি নাম উল্লেখ করতে হয়, নাথতন্ত্রকে সাধারণ তন্ত্র ভাবনা থেকেও খুব সহজেই আলাদা করা যায়।

আসলে সূফীদের ওপর নাথদের প্রভাব পড়েছে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর সংস্কৃত গ্রন্থ 'অমৃতকুণ্ড'-তে সূফিদের ওপর নাথ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। 'অমৃত্তকুণ্ড' বইটি মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষে সূফী সাধকদের দ্বারা বেশ কয়েকবার অনূদিত হয়েছে। তবে 'পদ্মাবতী' কাব্যে সূফীদের ওপর নাথদের প্রভাবের বিষয়টি সেই সূত্র থেকেই আগত।

তন্ত্রে শিব শক্তির মিলনের দ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে। কাব্যে রত্নসেন হল সাধক আর পদ্মাবতী হল সাধকের উদ্দিষ্ট ঠিকানা— এখানে অলকা, শক্তি বিভিন্ন নামে পদ্মাবতীকে সম্বোধন করা হয়েছে। সাধক সাধনার মাধ্যমে শক্তিকে জাগরিত করে ব্রহ্মস্বরূপে মিলিত হন। যেমন একটি পদে রত্নসেন এবং পদ্মাবতীর মিলনকে শিবশক্তির মিলন বলা হয়েছে। যদিও প্রত্যেক সাধক প্রাথমিক অবস্থায় শিব। শক্তি জাগ্রত হলে সাধকের শিবস্বরূপ চৈতন্যপ্রাপ্ত হয়। এবং সে স্ব-স্বরূপে উপনীত হয়। 'পদ্মাবতী-রত্নসেন ভেঁটখণ্ড'-তে রয়েছে 'শিব শক্তি মিলিলে যে সিদ্ধি হয় কায়'। কায়সিদ্ধির কথাটি হঠযোগের মূলকথা। তা তন্ত্রোক্ত নয়। কায়সিদ্ধি এবং তন্ত্রকে মিশিয়ে নাথেরাই উপাসনা শুরু করেন।

তবে নাথদের কায়াসাধনপ্রণালীই পদ্মাবতীর কাহিনি কাঠামোকে ধারণ করে আছে। মধ্যযুগের এই কাব্যটিকে রূপক কাব্য নামে অভিহিত করলে খুব বেশি বলা হবে না। আবার প্রতীকেরও যথেষ্ট ব্যবহার করা হয়েছে। পদ্মাবতী কাব্যের 'পদ্মাবতী রূপ বর্ণন খণ্ড'-অংশে পদ্মাবতীর রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে পদ্মাবতীকে ব্রহ্মদ্বারের শেষ স্তর ব্রহ্মজ্যোতির (হঠযোগ কায়া সাধনায় সুষুম্না ব্রহ্মদ্বার, এই দ্বার উত্তীর্ণ হওয়ার সাধকের ব্রহ্মপ্রাপ্তির কথা রয়েছে) সঙ্গে তুলনা করেছেন কবি—

> "তার মধ্যে সীমন্ত খড়্গের ধার জিনি।
> বলাহক মধ্যে কিবা স্থির সৌদামিনী।।
> স্বর্গ হোতে আসিতে যাইতে মনোরথ।
> সৃজিল অরণ্য মাঝে মহাসূক্ষ্ম পথ।।
> সেই পথে বাটোয়ার বৈসে অনুদিন।
> কূটিল অলকা মাঝে ব্যক্ত রক্তচিন্।।
> কিবা করটির মাঝে স্বর্ণ রেখাকার।
> যমুনার মধ্যে কিবা সুরস্বরী ধার।।
> জন্মান্তের বাঞ্ছাসিদ্ধি হৈতে সহসাত।
> ত্রিবেণী উপড়ে যেন ধরিছে করাত।।
> কিবা মুখচন্দ্র-আঁখি করাত দেখিয়া।
> ত্রাসে ফাটিয়াছে যেন তিমিরের হিয়া।।
> কার শক্তি আছে সেই পন্থে যাইবার।
> রুধির মিশ্রিত যেন তীক্ষ্ণ খড়্গাধার।।
> কদাচিত কেহ যদি যায় গম্য আশে।
> মন বন্দী হয় তার অলকার আশে।।"[৮]

এখানে কুণ্ডলিনী জাগরণের কথা তেমনভাবে বিস্তৃত না থাকলেও ব্রহ্মদর্শনের কথা আছে। পদ্মাবতীর দেহের বিভিন্ন অংশকে প্রতীকস্বরূপ ব্যবহার করে, তার দর্শন আর ব্রহ্মদর্শনকে মিলিয়ে দেখা হয়েছে। অর্থাৎ দেখা গেল, কায়া সাধনাকে প্রতীকস্বরূপ ব্যবহার করা হয়েছে পদ্মাবতী কাব্যে। এবং নারীকে ব্রহ্মের সঙ্গে মিলিয়ে বর্ণনা করা বৌদ্ধযুগের পর, এই

প্রথম দেখা গেল। সামন্ততান্ত্রিক যে সমাজে নারীদের প্রাধান্য ক্ষীণ, সেই যুগে নারীর অঙ্গকে কায়াসাধনার সঙ্গে বর্ণনা করে, প্রাধান্য দেওয়া— বিষয়টা সহজ ছিল না।

সরাসরি কুণ্ডলিনী তত্ত্বের কথা এসেছে একটি পদে—

> "তথাত কুণ্ডলী দেবী আছেন নিদ্রারত।
> সর্বরূপ ধরি যেন সুষুম্নার পথ।
> অধোমুখ চন্দ্র তথা অমিয়া বরিষে।
> উর্ধমুখী হইয়া কুণ্ডলী সব চোষে।।
> দরশন নহে পুনি শক্তি আর শিব।
> এই সে কারণে মরে সংসারের শিব।।"[৯]

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, যে সাধক প্রথম অবস্থাতেই শিব থাকে। এজন্য উপরে বলা হয়েছে 'মরে সংসারের শিব'। এইপদটি মূলত কায়সিদ্ধির পদ। নাথেদের মধ্যে এই কায়সিদ্ধিই ছিল মূল কথা। এরপূর্বেই বলা হয়েছে, কবি মূলত নাথদের কায়সিদ্ধিকে গ্রন্থের মধ্যে প্রয়োগ করেছেন। আগে কায়সিদ্ধি তারপর মুক্তি— নাথদের এ তত্ত্বকে সরাসরি তুলে ধরা হয়েছে সাহিত্যে।

এখানে তন্ত্রের আঙ্গিকে নয় সরাসরি হঠযোগের সাধনার চন্দ্র সূর্য তত্ত্বের কথা বলা হয়েছে। মাথায় থাকে চন্দ্র সেখান থেকে অমৃত রস বঙ্কনাল বেয়ে কুণ্ডলিনীতে এসে সঞ্চিত হচ্ছে। কালস্বরূপা কুণ্ডলিনী সেই রস ধারণ করছে ফলে জীবের গতি নিম্নগামী এবং সংসারের মধ্যেই জীব আবদ্ধ রয়েছে। তাই কবি বলছেন 'দর্শন নহে পুনি শক্তি আর শিব'। বায়ুর গতির সঙ্গে সঙ্গে যখন শক্তি এবং দেহের অমৃত উর্ধগামী হবে তখনই শিব এবং শক্তির মিলনে মানুষ মুক্তি লাভ করবে। এই কায়া সাধনার কথা আলাওল খুব সুন্দর ভাবে বুঝিয়েছেন।

চর্যাপদের পর আবার ছোট ছোট পদে কায়াসাধনাকে তত্ত্ব রূপে প্রয়োগ করার বিষয়টি আবার দেখা গেল শাক্ত পদাবলীতে এবং বাউল-ফকিরদের গানে। বাউল সাধনা বাংলাদেশে মধ্যযুগেই গড়ে উঠেছিল। বাউল সাধনার মধ্যে সহজিয়া মতের প্রভাব রয়েছে। প্রসঙ্গ সূত্রে বলতে হয়, সহজিয়া মতের উৎস নিয়ে যদিও বিতর্ক রয়েছে। শশীভূষণ দাশগুপ্ত অনুমান করেছেন যে, বৌদ্ধ সহজ সাধনা থেকেই এই মতের উৎপত্তি। আবার মনীন্দ্রমোহন বসু অনুমান করেন বৈষ্ণবদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সহজিয়া সাধকদের উৎপত্তি। বাউলদের মধ্যে বৈষ্ণব না বৌদ্ধ সহজিয়া মতের প্রভাব বেশি তা এখন অনুমান করেও বলা সম্ভব নয়। কারণ, যাইহোক, সহজ সাধনার মধ্যে মূলে একটি সাদৃশ্য বর্তমান, এই ভিন্নমার্গের সহজ সাধকেরা সহজ পথের কথা বলেছেন, সহজ পথে সিদ্ধির কথা বলেন। তবে প্রণালীগত কিছু পার্থক্য রয়েছে। নীচের পদে সহজ সাধনার ঐক্য তুলে ধরা গেল—

> "ওকি সামান্য তার মর্ম পাওয়া যায়।
> ওসে হৃদয়কমলে উদয় হলে অজানা খবর জানা যায়।
> দুধে যেমন ননী থাকে।
> ধরে খায় রাজহংস তাকে।।"[১০]

তুলনীয় চর্যাপদের ৪২ নম্বর পদটি, সেখানেও কাহ্নপা সহজের স্বরূপকে দুধে ননীর উপমায় ধরেছেন—

> "মুঢ়া অচ্ছন্তে লোঅ ণ পেখই।
> দুধ মাঝে লড চ্ছন্তেঁ ণ দেখই।।"[১১]
> (মূঢ় লোক দেখতে পায় না, দুধ মাঝে ননী দেখতে না পাওয়ার মত।)

এ থেকে বাঙালির আধ্যাত্মিক সাধনার-ভাবনার ঐতিহ্যকে, সমান্তরালভাবে প্রবাহিত ভাবধারাকে অনুধাবন করা যাবে।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলাদেশে পালিত ধর্মতন্ত্রের সঙ্গে কায়াসাধনার সংশ্লিষ্টতা সর্বস্তরের বাঙালির আধ্যাত্মিক চেতনার বিশেষ পরিচয় বহন করছে। আবার, জন্মলগ্ন থেকেই বাংলা সাহিত্য কায়াসাধনা সম্পৃক্ত। শুধু হিন্দুদের রচিত কাব্যে নয়, মুসলমানের রচিত কাব্যে কায়াসাধনার কথা বারবার এসেছে। এ প্রসঙ্গে সিদ্ধান্তে আসতে হয়,

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 01
Website: https://tirj.org.in, Page No. 01 - 08
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আধুনিক ঘুমঘোরে নিমজ্জিত বাঙালি জাতির মধ্যে কায়াসাধনার ঐতিহ্য ছিল। দেহের মধ্যে দেহাতীতকে দেখবার বিশেষ আকাঙ্খা ছিল। বর্তমানে এ সমস্ত বিদ্যাও বিপুপ্ত হয়েছে, তার অবক্ষয় ঘটেছে। আধুনিক বিশ্বায়ন মনোভাবাপুষ্ট সমাজ আধ্যাত্মিকতার মনোভাবকে পুরোপুরি নষ্ট করেছে। সেটাও স্বাভাবিক। তবে প্রাচীন বাংলাদেশ ছিল আধ্যাত্মিকতার পৃষ্ঠভূমি। কারণ ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিক দেশ।

Reference:

১. দাশ, নির্মল, ‘চর্যাগীতি পরিক্রমা’, কলকাতা, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৪২১, পৃ. ৮৫
২. তদেব, পৃ. ৯০
৩. ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন, (সম্পা), বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য, কলকাতা, দে’জ পাবলিশিং, ২০১৪, পৃ. ২৮৫
৪. মুনসী আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ (সম্পা), ‘গোরক্ষবিজয়’, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দির, কলকাতা, ১৩২৪, পৃ. ৩৩
৫. দাশগুপ্ত, জয়ন্ত কুমার (সম্পা), কবি বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ, কলকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৯, পৃ. ১৬১
৬. তদেব, ১৬২
৭. তদেব, ১৬৩
৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ, (সম্পা), জায়সী ও আলাওল, পদ্মাবতী, রূপা এণ্ড কোম্পানী, ১৯৮৮, পৃ. ৬৮
৯. তদেব, ২৫০
১০. বন্দ্যোপাধ্যায়, সোমেন্দ্রনাথ, বাংলার বাউল কাব্য ও দর্শন, বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৫৪, পৃ. ৭৭
১১. দাশ, নির্মল, ‘চর্যাগীতি পরিক্রমা’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৪২১, পৃ. ৫০